প্রথম অধ্যায়

ক. প্রস্তাবনা : মার্কসবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

হাইনরিখ কার্ল মার্কস ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ৫মে প্রুশিয়ার ট্রিয়ার শহরে এক আইনজীবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হেনরিখ মার্কস, মা হেনরিয়েটা। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত মার্কস পড়াশোনা করেন ট্রিয়ারে, পরে বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বার্লিনে অধ্যয়ন কালে হেগেলীয় দর্শনে আকৃষ্ট হন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে 'ডেমোক্রিটাসের প্রাকৃতিক দর্শন ও এপিকিউরাসের প্রাকৃতিক দর্শনের প্রভেদ' বিষয়ে ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার আশা ত্যাগ করে পত্রিকা সম্পাদনায় যুক্ত হন। কোলোনের র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া পত্রিকা 'Die Rheinsche Zeitung'-র সম্পাদক হন ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। এই পত্রিকাটির বিপ্লবী গণতন্ত্র প্রবণতায় প্রুশীয় সরকার রুষ্ট হয়। পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়। ওই বছরই প্যারীতে বন্ধু এঙ্গেলস্ (জন্ম : ২৮ নভেম্বর ১৮২০, প্রুশিয়া; মৃত্যু : ৫ আগস্ট, ১৮৯৫)-র সঙ্গে পরিচয় হয়। উভয়ের দীর্ঘ গবেষণায় হেগেলীয় দর্শনের বিপ্লবী গণতন্ত্র পর্যায়ের অবসান ঘটে এবং বস্তুবাদী কমিউনিস্ট চেতনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় মার্কসের প্রথম ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'Economic-Philosophical Manuscripts'—অর্থনীতি ও দর্শন শাস্ত্র বিষয়ক পাণ্ডুলিপি। ১৮৪৪-এ যে ভাবনার উন্মেষ তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন দেখলাম ১৮৪৮-এ। ১৮৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট লিগের জন্য রূপায়িত কর্মসূচি প্রকাশিত হয় ১৮৪৮-এ—যে কর্মসূচি সারা ইউরোপে আলোড়ন তৈরি করেছিল তা হল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। লন্ডনে গঠিত কমিউনিস্ট লিগই শুধু নয়, পরবর্তীকালে মার্কস-এঙ্গেলস-এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলির একটি সংঘবদ্ধ মঞ্চ গড়ার জন্য ১৮৬৪-তে লন্ডনে গঠিত হয় International Working Men's Association—যার নেতা নির্বাচিত হন মার্কস্। দীর্ঘ দিনের গবেষণায় ১৮৫৯-এ প্রকাশিত হয় 'রাজনৈতিক অর্থনৈতিক

সমালোচনা', ১৮৬৫-তে প্রকাশিত হয় 'মূল্য দাম ও মুনাফা' নামক গ্রন্থ। মার্কসের মহাগ্রন্থ 'দাস ক্যাপিট্যাল' -এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত এঙ্গেলস্-এর সম্পাদনায় যথাক্রমে ১৮৬৫ ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ লন্ডনে এই মহান দার্শনিকের মৃত্যু হয়।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর চিন্তা ও অনুশীলনলব্ধ এক বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বই হল মার্কসবাদ। সমালোচকরা একেই পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন। The International Encyclopedia of Rovolution and Protest-এ মার্কসবাদের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাও অনেকটা ওই রকম—''Marxism is a body of thought and a practical approach to reality based on contribution of two revolutionaries, Karl Marx and Friedrich Engles who were intent on developing what they called 'Scientific Socialism' ''[১] এই তত্ত্ব ঊনবিংশ শতকে ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। এই তত্ত্ব হল—''প্রকৃতি ও ইতিহাসের গতি, পরিবর্তন ও রূপান্তরের তত্ত্ব।''[২] মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানব প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। ইতিহাসের গতিপথে সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটে। মানুষ এই গতিধারার একটি অন্যতম উপাদান। মানুষ নিজেই সক্ষম তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে। সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান এই মানুষ। শ্রমের বিনিময়েই মানুষ তার জীবন নির্বাহ করে। ব্যক্তিগত মালিকানা, বলা ভালো, সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার—উপাদান সমূহের একক মালিকানা, শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে উৎপাদনের ফল থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানে মানুষের মুক্তি আসে শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে ওঠে। আগেই আলোচনা করেছি, মার্কসবাদ হল একটি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বিপ্লবতত্ত্ব। মার্কস ফয়্যারবাখের উপর এগারো নম্বর থিসিসে লিখেছেন—''Philosophers have only interpreted the world in various ways; the point is to change it.''[৩] এই পরিবর্তন বা রূপান্তরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয়ে মার্কসবাদী পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই দ্বন্দ্ব বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনেকখানি বৈজ্ঞানিক। ''Marx's dialectic is scientific because it explains the contradiction in thought and the crisis of socio-economic life in terms of the particular contradictory essential relations which generate them.''[৪] দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে এঙ্গেলস গতিবিজ্ঞান বলেছেন। এই দ্বন্দ্ববাদের গোড়ার কথাই

হল—Contradiction is motion. পরস্পরবিরোধী অস্তিত্বের দ্বন্দ্বই হল গতি। যে-কোনো 'অস্তিত্ব' (Thesis)-এর মধ্যে 'বিরুদ্ধ অস্তিত্ব' (Anti-thesis) বর্তমান। মানবদেহে যেমন নিরন্তর কোষ সমূহের ধ্বংস ও সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি সমাজজীবনেও বিভিন্নভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলছে। উৎপাদন সম্বন্ধ ও উৎপাদিকা শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সামাজিক যুগগুলিকে ভেঙেছিল যা দাস ব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যন্ত এই সত্য কার্যকর। মানুষের চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি সমাজ পরিবর্তনে সহায়তা করে। ''মানুষ যখন এমন সব চিন্তার কথা বলে—যা সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ঘটায় তখন তারা এই বাস্তব অবস্থাকেই ব্যক্ত করে যে, পুরাতন সমাজের অভ্যন্তরে একটি নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়েছে এবং পুরাতন ধ্যানধারণার বিলুপ্তি, পুরাতন অস্তিত্বের শর্তসমূহের বিলুপ্তির সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলে।"[৫] সামাজিক দান্দ্বিকতার অনিবার্য ফল শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি মার্কস তাঁর তত্ত্বচিন্তাকে পুঁথিবদ্ধ করে রাখতে চাননি, তাই তিনি ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস যৌথভাবে ১৮৪৭-এ লন্ডনে গঠন করেন 'কমিউনিস্ট লিগ' নামে একটি 'বেআইনি' কমিউনিস্ট সংগঠন, যার কর্মসূচি ও সাংগঠনিক উদ্দেশের রূপরেখা হিসাবেই আত্মপ্রকাশ ঘটে ইউরোপ কাঁপানো বই 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। এই কমিউনিস্ট লিগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা লিখেছেন—''The aim of the League is the over–thruw the bourgeoisie, the rule of the proletariat, the abolition of the old bourgeois socity based on the class antagonisms and the foundation of a new society without classes and without private property."[৬] 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ইংরাজি সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস যেকথা লিখেছেন, তার বাংলা তর্জমায় বলা যায়—''যদিও ম্যানিফেস্টো আমাদের দু-জনের রচনা, তবু আমার মনে হয় আমার বলা উচিত যে, এর মূল যে প্রধান বক্তব্য রয়েছে সেটা মার্কসের নিজস্ব।"[৭] এই ইস্তাহারে প্রকাশিত মার্কসের নিজস্ব বক্তব্যটি কী? মার্কস লিখেছেন, ''মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামেরই ইতিহাস; শ্রেণিসংগ্রামের এই ইতিহাস হলো বিবর্তনের ধারা বিশেষ যা আজকের দিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে একই সঙ্গে সমগ্র সমাজকে সকল শোষণ নিপীড়ন শ্রেণি পার্থক্য শ্রেণিসংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়েই শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণিটি অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত, শোষক শাসক অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির কর্তৃত্বের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে না।"[৮] এটাই সংক্ষেপে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলকথা। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতিগুলির প্রয়োগই হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসের মূল ওই ব্যক্তব্যকে ভিত্তি করেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে দেখানো হয়েছে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রক্রিয়া আর সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা।

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে উল্লেখ করা মার্কসের প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যটিকে আলোচনার বিস্তারের স্বার্থে আরও একবার উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করবো। তিনি লিখেছেন—''মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।'' এই ইতিহাস বলতে (১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) সমগ্র ইতিহাকেই বোঝাতো। কিন্তু 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ'-এর ধারণাটিকে উন্মোচিত করেন লুই হেনরি মর্গান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি' (১৮৭৭)। এঙ্গেলস্ তাঁর 'পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে লিখেছেন—''মর্গানের মহৎ কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে তিনি আমাদের লিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করেন।'[৯] অর্থাৎ আদিম যৌথ সমাজকে বাদ দিয়েও মার্কসের ওই বক্তব্যকে আমাদের দেখতে হবে।

'শ্রেণিসংগ্রাম'-এর ধারণায় ইতিহাসের ক্রম পর্যায়ে একটু আলোকপাত করা যাক। ইতিহাসের এক পর্যায়ে দেখা যায় দাস ব্যবস্থার পতনের পরে পরেই সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। সমাজের বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে বাণিজ্য ও মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ও বিকাশ এবং পৃথিবীব্যাপী বাজার গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মাঝে এক নতুন শ্রেণি দেখা দিল, এরাই হল বুর্জোয়া শ্রেণি। সামন্তসমাজে বুর্জোয়ারা ছিল এক নিষ্পেষিত শ্রেণি। এই বুর্জোয়ারা দীর্ঘ অবহেলা সহ্য করার পর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েমের দিকে পা বাড়ালো। দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা নিজেদের শ্রেণি হিসেবে গড়ে তুলল এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের সামনের সারিতে নিয়ে এল। মার্কস এঙ্গেলস ম্যানিফেস্টোতে লিখেছেন—''উৎপাদন ও বিনিময়ের যেসব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেকে গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপত্তি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্ত, কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন, এক কথায় সম্পত্তির সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই ইতিপূর্বে বিকশিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে খাপ খেল না, এগুলিই তখন এতগুলি শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১০] এই বুর্জোয়া শ্রেণিও তার কর্তৃত্বকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারল না। নতুন নতুন বাজার দখলের জন্য বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিল। মার্কস সঙ্গত কারণেই লিখেছেন—''যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভূতলশায়ী করেছিল সেই অস্ত্র আজ তাদের বিরুদ্ধেই উদ্যত।''[১১] ধনতান্ত্রিক শক্তির উত্থান, তাদের বিস্তৃতি এবং একের পর এক অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিরোধ প্রভৃতির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে তৈরি হল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি। এই শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গেই চলল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধপূর্ণ লড়াই। এই লড়াই-এর মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণি বিপ্লবী প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে যায় এবং মুক্তি সংগ্রামে জয়ী হতে চায়। শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হতে হলে শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব বিপ্লবী পার্টি

থাকা দরকার। শুধু বিপ্লবী পার্টি থাকলেই হয় না, পার্টির সুদক্ষ নেতৃত্ব থাকা জরুরি।" শ্রমিক আন্দোলনের নবপর্যায়ে মূল রাজনৈতিক কর্তব্যরূপে প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের প্রশ্ন উত্থাপনকালে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর ভরসা ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মীদের সমর্থন।"[১২] শুধু কর্মিবাহিনীর সমর্থন শুধু নয়, পার্টি গঠনের সংগ্রাম আর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণকে জয় করে আনার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে সফল করা যায়। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের লড়াই মূলত শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষায় লড়াই করা। সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ ছাড়া কমিউনিস্টদের দ্বিতীয় কোনো স্বার্থ নেই—মার্কসের এই মনোভঙ্গী মার্কস-পরবর্তী দুনিয়ায় রক্ষিত হচ্ছে কিনা সেটা ইতিহাসের বিচার্য। কিন্তু মার্কস দুনিয়ার সব শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে ডাক ম্যানিফেস্টোতে দিয়েছেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজ সমানভাবে বিরাজ করছে। মার্কস তাঁর কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র দেখে যেতে পারেননি।— "Yet Marx realized that European revolutions were becoming more dependent on the general world situation. And later in his life he came to believe that Russia might prove the starting point of the revolution which begins this time in the east, hither to the invulnerable bulwark and reinforcement of the counter revolution."[১৩]

মহামতি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব দ্বারা জারতন্ত্রের অবসান হয় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটে। লেনিন, মাও-জে-দং, হো চি মিন প্রমুখ মার্কসবাদীদের দ্বারা মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রয়োগ ঘটেছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে। মার্কস-এঙ্গেলস-এর এই তত্ত্বচিন্তা যা মার্কসবাদ নামে খ্যাত তা কীভাবে ভারতে প্রবেশ করল, ভারতীয় মনন তাকে কীভাবে গ্রহণ করল বা তাকে কীভাবে প্রয়োগ করলো, অর্থাৎ ভারতে মার্কসপন্থী পার্টি সংগঠনের ভিত্তিভূমি কীভাবে গড়ে উঠল, তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। আলোচনা হবে রাজনীতি সচেতন বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্যে কীভাবে মার্কসীয় চেতনা রেখাপাত করল তা নিয়েও। আমরা একই সঙ্গে আলোচনা করব এই পন্থার সীমাবদ্ধতা বিষয়েও। তারপর সেই আলোচনার সূত্রগুলিই নিয়ে যাবে গবেষণার মূল বিষয়ে।

উল্লেখপঞ্জি

১. Ness, Immanuel (Ed.) *The International Encyclopaedia of Revolution and Protest, Vol. 5,* Wiley-Blackwell, UK, 2009, p. 2239

২. উমর, বদরুদ্দিন, *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ২২

৩. Marks-Engles, *Selected Works*, Vol-I, Progress, Moscow, 1969, p. 15
৪. Top Bottomore (Ed.), *Marxist Thought*, Maya Blackwell, 2nd edtion, New Delhi, 1991, p. 146
৫. Marks-Engles, *Communist Manifesto; Selected Works*, সূত্র : বদরুদ্দিন উমর, *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ২৩
৬. Marks-Engles, *Selected Works*, Vil. 2, Lawrance and Wishart Ltd. London, 1943, p. 16
৭. মার্কস-এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার* (বাংলা সংস্করণ), এন.বি.এ. প্রা. লি., ১৯৯৮, পৃ. ১২
৮. ঐ
৯. এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক, *পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*, এন.বি.এ. প্রা. লি., ১৯৯৯, পৃ.২
১০. মার্কস-এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার* (বাংলা সংস্করণ), এন.বি.এ. প্রা. লি., ১৯৯৮, পৃ. ৩৪
১১. ঐ, পৃ. ৩৫
১২. স্তেপানভা, ইয়েভগেনিয়া, *কার্ল মার্কস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৭, পৃ. ৩৯২
১৩. Mclellan, David, 'Politics', 'Marx the First 100 Years', edited by David McMellan; The University Press, Oxford, 1983, p. 153

খ. ভারতে মার্কসবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতে মার্কসবাদ প্রচারিত হবার পূর্বে বা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইউরোপের সাম্যচিন্তার সঙ্গে পরিচিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী অংশ। জাঁ জ্যাক রুশোর 'সাধারণের ইচ্ছা তত্ত্ব', বেন্থাম ও মিলের 'হিতবাদী তত্ত্ব' বেকন, লক্, হিউম, পেইন-এর যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ, লুই ব্লা, সাঁ সিঁসো, রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফ্যুারিয়েরের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবী অংশকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর তারই ভিত্তিতে রামমোহন রায়ের রচনায়, কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় কৃষক শ্রমিকের উন্নতি কল্পে কিছু কিছু কথা পাওয়া যায়। ''১৮৭৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র একটি সংখ্যায় পূর্ববঙ্গে পাগলপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা টিপুর সাম্যবাদী মতবাদ প্রচারের উল্লেখ করে দেখা যায় তাকে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক নেতা লুই ব্লাঁঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। সমকালীন সময়ে তিলকের 'কেশরী' পত্রিকাতেও আমরা সমাজতন্ত্র ও কার্ল মার্কসের উল্লেখ পাই।''[১] প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকের প্রথমভাগ থেকেই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের আভাস ফুটে উঠতে থাকে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সোরাবজি শাপুরজি বেঙ্গলী ফ্যাক্টরিতে শিশুশ্রমের নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্দোলন করেন। ''নারায়ণ মেঘজি লোখাণ্ডে ছিলেন ভারতে প্রথম শ্রমিক নেতা।''[২] তাঁর ডাকে মুম্বাইয়ের ছয় হাজার মিলমজুরের এক সভায় সপ্তাহে একদিন ছুটি, মধ্যাহ্নিক কর্মবিরতি, কাজের ঘণ্টার হ্রাস প্রভৃতির দাবিতে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ফ্যাক্টরি কমিশনের কাছে পেশ করার জন্য। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লোখাণ্ডে বম্বে মিল্হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ''ইহাই ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন।''[৩] এছাড়াও শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের ওয়ার্কিং মেনস্ মিশন, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরানগর ইনস্টিটিউট, কলকাতার ওয়ার্কিং মেন্স ইনস্টিটিউট প্রভৃতি। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগর চটকল শ্রমিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অপর এক ব্রাহ্ম সমাজনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় চা বাগিচার শ্রমিকের উপর শোষণ মূলক ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন শিবনাথ শাস্ত্রী। কিন্তু উপরিউক্ত শ্রমিক সংঘ বা শ্রমিক কল্যাণে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবী অংশ পরিচালিত আন্দোলনে কোনো শ্রেণিচিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায় নি। অনেকটা পরে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শ্রমিক আন্দোলনে শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টি উপলব্ধ হল। রুশ বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রভাব ভারতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষের মনে বিপ্লবের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। যদিও তার আগে মার্কস-এঙ্গেলস্ রচিত 'কমিউনিস্ট লিগ' (১৮৪৭ জুন)-এর কর্মসূচি 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে যায়। স্বভাবিকভাবে ভারতেও। ১৯১৭-র রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব শুধু শ্রমিক অংশে নয়, বুদ্ধিজীবী তরুণ ছাত্রযুব জনঅংশকেও আলোড়িত করেছিল। আর তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

সোভিয়েত বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় ভারত থেকে কিছু মুজাহির (আত্মনির্বাসিত) যুবক আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়া পৌঁছান। সেখানে মানবেন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের আগ্রহে ও সহযোগিতায় ১৯২০, ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করে।

''নিম্নলিখিত সভ্যগণকে নিয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় :

১. এম.এন. রায়, ২. এভেলিনা টেন্ট রায়, ৩. এ, মুখার্জি, ৪. রোজা ফিটিংগোফ, ৫. মুহম্মদ আলী (আহ্মদ হাসান), ৬. মহঃ শফীক সিদ্দিকী, ৭. এম. প্রতিবাদী বায়াঙ্কর আচার্য।

মুহম্মদ শফীক সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থার্ড ইন্টারন্যাশনালের বিঘোষিত নীতির অনুসরণ করবে এবং ভারতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা প্রোগ্রামও রচনা করবে।''[৪]

জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আমেদাবাদ অধিবেশন ও ১৯২২-এর গয়া অধিবেশন প্রভৃতি থেকে কমিউনিস্টরা পূর্ণ স্বরাজের দাবিকে জোরদার করতে থাকেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে ভারত বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্তদের প্রধান এম.এন. রায় চাইছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসকে গান্ধীজির রক্ষণশীল চিন্তাধারা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস এবং সামন্ততান্ত্রিকতা, বণিকশ্রেণির স্বার্থপন্থী প্রবণতা থেকে মুক্ত করে শ্রমজীবী জনঅংশের মুক্তির অভিমুখী করতে। সেজন্য সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনদের উপর তিনি বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। তবে এই উদ্যোগ কোনো ইতিবাচক ফললাভ করেনি। এম.এন. রায়ের দুই অনুগামী নলিনী গুপ্ত ও মহঃ শফীক ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ধরা পড়ে যান এবং তাঁদের বিরুদ্ধে শুরু হয় পেশায়ার

কমিউনিস্টদের মামলা। তার রেশ কাটতে না কাটতেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যায় কুখ্যাত কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪)। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২১ধারা অনুসারে কানপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। মামলায় আসামী ছিলেন এস.এ. ডাঙ্গে, শওকত ওসমানি, মুজফ্‌ফর আহমদ, নলিনী গুপ্ত, গোলাম হোসেন, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার রামচরণলাল শর্মা, মানবেন্দ্র রায়। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ''মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ...এবং ভারতকে ব্রিটেনের কাছ থেকে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলমুক্ত করে স্বাধীন করার বিপ্লবী ষড়যন্ত্র করছে।''[৫]

এই কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় এস.এ. ডাঙ্গে, শওকত ওসমানি, মুজফ্‌ফর আহমদ্ ও নলিনী গুপ্ত এই চারজনের চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়।

এই কানপুরেই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠা পেল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের অন্যতম নেতা সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে অনেকখানি সক্ষম হল। ১৯২৭-এ সোভিয়েত রাশিয়ার দশম জন্মবার্ষিকী পূর্ণ হয়। কমিউনিস্ট আন্দোলন আরও প্রসারিত হল। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের শ্রমজীবী অংশে কমিউনিস্টরা পৌঁছে যেতে সক্ষম হল। এই সময়ে কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলনও আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ''শুধু ১৯২৮ সালেই দেশে অন্তত ২০৩টি ধর্মঘট হয়, ৫,০৫,০০০ কর্মী এইসব ধর্মঘটে যোগ দেয়। বোম্বাই ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে বস্ত্রশিল্প কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী 'গির্নিকামগর' সংগঠনের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, ম্যাড্রাস অ্যান্ড সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে'-র কর্মীরা ও বিপ্লবী কর্মপন্থার ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। দেশের বিভিন্ন শহরে কীর্তি, মজদুর, কিষাণ, সপার্ক এবং ক্রান্তি নামে অনেকগুলি কমিউনিস্ট পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। ...তবে সমাজবাদী সংগ্রামের জন্য বামপন্থী সংগঠনগুলি তখন সুশৃঙ্খলভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি।''[৬] তবে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা ইংরেজ শাসককে চিন্তায় ফেলেছিল। গির্নিকামগড় ইউনিয়ন, রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘট কানপুর, কলকাতাতেও বিস্তৃত হয়েছিল। আর এ-সবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯-এর ২০-এ মার্চ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তেত্রিশ জন কমিউনিস্ট শ্রমিক কৃষক নেতাদের গ্রেফতার করে মিরাটে আনা হল। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২১ধারা অনুসারে শুরু হয় মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা। এই

মামলায় যাঁরা আসামী ছিলেন তাঁরা হলেন, ফ্রান্সিস ব্রাডলে, ফিলিপ স্প্রাট, মুজফ্‌ফর আহমদ, সামসুল হুদা, অযোধ্যা প্রসাদ, মোহন সিং যোশ, মীর আব্দুল মাজিদ, পি.সি. যোশি, এস.এ. ডাঙ্গে, বিষ্ণু ঘাট্টে, গঙ্গাধর অধিকারী প্রমুখ। এঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট নেতা। ১৯৩৩ অবধি এই মামলা চলেছিল। অধিকাংশ বন্দিই দোষী সাব্যস্ত হন এবং বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। ''বন্দিদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন তাঁরা নিজেদের মতবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে একটি দীর্ঘ বয়ান পেশ করেন, কিন্তু সেটিকে চেপে দেওয়া হয়।''[৭] রজনীপাম দত্ত লিখেছেন,—''The working class was decapitated and the strongest and most clear headed and determined leaders of the left, with a real mass basis, removed, before the struggle in the hands of the Congress leadership was allowed to begin.''[৮]

এই মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার আরও একটি ইতিবাচক দিক হল—এই মামলার দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ আরও বেশি করে জেলের অভ্যন্তরে অন্যান্য বিপ্লবী বন্দিদের মার্কসীয় দর্শন ও সাহিত্য অধ্যয়ন করান। আন্দামান জেলের বিপ্লবীরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, মুক্ত হবার পর ওইসব বন্দিরা অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

১৯৩০-এর পরবর্তী পর্বে ভারতের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। যেমন, গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার, লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে আপসনীতি তৎকালীন জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মনে হতাশা সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ''ভগৎ সিং এবং আরও অনেক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী মার্কসবাদের কিছু মূল বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জেলের ভিতরে ও বাইরে সন্ত্রাসবাদকে নতুন আলোকে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। ক্রমে সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করে গণবিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হলেন।''[৯] ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্তরা বাংলার বিপ্লবীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যেমন মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার প্রমুখ। কমিউনিস্ট মতাদর্শ, হিজলি, বক্সার বা মান্দালায় অথবা আন্দামানের কারাকক্ষের বিপ্লবীদের বোমা-নির্ভর রাজনীতি থেকে সরিয়ে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। ''১৯৩৫-এর মে দিবসে আন্দামান জেলের একত্রিশ জন বন্দি একটি কম্যুনিস্ট কো-অর্ডিনেশন (Communist Co-odrination) গঠন করেন; ভগৎ সিং-এর অবশিষ্ট সহকর্মীরাও এর অন্যতম উদ্যোক্তা। চট্টগ্রাম দলের যাঁরা আন্দামানে ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ কমিউনিস্ট হন।''[১০]

এই সময়পর্বের আরও বেশ কিছু ঘটনা ভারতের রাজনীতিকে ঘনীভূত করে তুলেছিল।

শোলাপুরে সুতোকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কিছু শ্রমিকের মৃত্যু হয়, চারজনের ফাঁসি হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোর জেলে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেবের ফাঁসি হয়। দেশের আপামর মানুষ, উদ্বেলিত হয়েছিল উপরিউক্ত ঘটনায়। কিছু প্রগতিপন্থী কংগ্রেস কর্মী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ইংরেজ রাজশক্তি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকশ্রেণির আন্দোলনে আশঙ্কিত হন এবং ১৯৩৪-এ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নিষিদ্ধ ঘোষণার কারণ হিসাবে সুবোধ রায় লিখছেন—''The reason for this action were briefly that the Meerut conspiracy case had proved that the Communist Party of India was a revolutionary party with the avowed object of overthrowing the existing order of society and bringing about independence by means of violent revotution, seeking to secure this object by mass revolutionary action strikes, demonestrations.''[১১] এই ১৯৩৪-এই গঠিত হল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (C.S.P), জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে। প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই দলের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ''১৯৩৫ সালে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্বের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে যখন কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের নীতি গ্রহণ করলো তখন এই সি.এস.পি.-র মধ্যেই তারা সেই বে-আইনী যুগে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে শুধু নয়—তার বিস্তার ঘটায়।''[১২] বিভিন্ন কৌশলে কমিউনিস্টরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। বিভিন্ন গণ-সংগঠনকে সক্রিয় রেখেও কমিউনিস্ট পার্টির তার কর্মসূচি রূপায়ণ করতে থাকে। বি.টি. রণদিভে লিখছেন—''এটাই ছিল সেই সময় যখন কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে উভয় দিক থেকেই কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের ভিতরে অবস্থিত বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিলেন, এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অটল যোদ্ধা হিসাবে নিজেদের ভাবমূর্তি ভালভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন।''[১৩] এই সময়ের বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জর্জি ডিমিট্রভ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম অধিবেশনে যুক্ত ফ্রন্ট থিসিস পেশ করেন, এবং ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতাকে সামনে এনে কমিউনিস্ট উদারপন্থাকে তুলে ধরলে ভারতে কমিউনিস্ট-দের আন্দোলন সংগ্রামের জায়গাটাও চওড়া হয়।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এই বছরই লাহোরে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশন বসে। জওহরলাল নেহরু সভাপতি। তাঁরই সভাপতিত্বে ঐ বছরই গঠিত হয় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (AISF), নিখিল ভারত কিষাণ সভা (AIKS) এইভাবে বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে ওঠায় কমিউনিস্ট পার্টি তার গণভিত্তি সুদৃঢ় করতে থাকে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ''কংগ্রেসে জওহরলালের ইংরিজী এবং হিন্দী বক্তৃতা শুনলাম—বাস্তবিকই ১৯৩৬ সালের সেই ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। সমাজবাদের কথা স্পষ্ট করে তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্বর ভূমিকার বিশ্লেষণ করলেন, বামপন্থা যেন নতুন আর উজ্জ্বল এক পথের সন্ধান পেল।... সভাপতি জওহরলাল শ্রমিক কৃষকদের সংস্থাকে আহ্বান জানালেন সংঘগতভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কথা ভাবতে।''[১৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করেছে। বিশ্বজুড়ে আর একটি সংকট নেমে এল। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার ঢেউ আছড়ে পড়ল ইংরেজ উপনিবেশ ভারতবর্ষেও। একদিকে সোভিয়েত, ইংল্যান্ড, আমেরিকা অন্যদিকে জার্মানি, ইতালি, জাপান। ভারত দ্বিধান্বিত। জাতীয় কংগ্রেস এই যুদ্ধে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে ঘোষণা করল—এই যুদ্ধে ইংরেজকে কোনোরূপ সহযোগিতা নয়, ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একটিমাত্র আওয়াজ—এই যুদ্ধে ''না এক পাই, না এক ভাই।'' ''কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু এই সময়টিকে প্রথমাবস্থায় কাজে লাগায় ব্রিটিশবিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে।''[১৫] বোম্বাই-এ দেড় লক্ষ শ্রমিকের চল্লিশ দিন ধর্মঘট চলে, বিহারের চিনিকল, কলকাতার ঝাড়ুদার, ঝরিয়ার কয়লা শ্রমিক, অন্ধ্রে উপজাতিরা এই সময় তাদের আন্দোলনকে আরও তীব্র করে। তবে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কংগ্রেসের যুদ্ধবিরোধী অবস্থানের পক্ষে থাকলেও পরবর্তীকালে ১৯৪১-এর ২২ জুন নাৎসি বাহিনী সোভিয়েতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে কমিউনিস্ট পার্টি তার জনযুদ্ধ নীতি ঘোষণা করে। পাটনায় AISF-এর এক সভা থেকে পার্টি তার 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষণা করে। পার্টির এই 'জনযুদ্ধ' নীতি জাতীয়তাবাদী মানসিকতার মানুষ তো বটেই পার্টির অভ্যন্তরেই অনেকে তখনই দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন। ''জনযুদ্ধ নীতি নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক হয় তার প্রমাণ হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর প্রায় ছয় মাস সময় লেগে যায় 'জনযুদ্ধ' নীতিকে পার্টি লাইন রূপে ঘোষণা করতে।''[১৬] তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল, ফ্যাসিবিরোধী জোটের জয়লাভ বিশ্বের জনগণের স্বার্থের সপক্ষে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সপক্ষে। কারণ তা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে এবং ভারতকে আর দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখা ব্রিটিশের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। ''History gives only one message to the proletariat, win the war quickly for the Soviet—defeat Nazis with the help of its former allies. That is the only guarantee of your liberation.''[১৭] এর আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে সোভিয়েতের প্রতি সংহতি জানানোর উদ্যোগ।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''আঞ্চলিক ও পরাক্রান্ত ফ্যাসিস্ট তাণ্ডবের সংবাদ জগৎকে স্তম্ভিত করেছিল আর আমাদের মনের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল সোভিয়েট ভূমি সম্বন্ধে নতুন এবং একান্ত আত্মীয় এক অনুভূতি।... স্থির করি সেদিনই সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি (Frients of the Soviet Union, F.S.U.) নামে সংস্থা গড়ার জন্য কমিটি খাড়া করা যাবে।... সর্বজনপ্রিয় ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন সভাপতি, স্নেহাংশু এবং আমি সম্পাদকের ভার নিলাম, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেদিনই বৈঠক বসল।''[১৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন বহুদিন বে-আইনি থাকার পর ১৯৪২-এর ২৩ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হয়। প্রকাশ্য কর্মসূচি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইকে কমিউনিস্ট পার্টি আরও প্রসারিত করে। 'জনযুদ্ধ' পর্বে পার্টির হারানো গর্ব তাঁরা পুনরুদ্ধার করেন ১৯৪৩-এ বাংলা জোড়া দুর্ভিক্ষে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন গ্রামগঞ্জে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় তার সঙ্গে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের খাদ্য মজুত রাখার কারণে এবং তৎকালীন প্রশাসনের কঠোরতার ফলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে অন্তত ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখার্জি লিখেছেন, ''সারা ভারতের জনগণের কাছে বাংলার সর্বনাশা দুর্ভিক্ষর ছবি তুলে ধরার ডাক দেয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। যেমন বাংলার অভ্যন্তরে রিলিফের কাজ চলছে সর্বত্র, তেমনি বাংলার শিল্পী, গায়ক নাট্যকাররা বেরিয়ে পড়েছেন দল বেঁধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুধিত বাংলার সংকট সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসার আবেদন নিয়ে।''[১৯]

১৯৪৬-এ ভারত দেখল আর এক বিপ্লবের আয়োজন। নৌসেনা বিদ্রোহ। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সেনানি ক্যাপ্টেন রসিদ আলির বিচারের নামে প্রহসন হলে গোটা দেশ ফেটে পড়েছিল। হরতাল পিকেটিং-এ গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। নৌসেনা বিদ্রোহ আরও নতুন মাত্রা যোগ করল। বোম্বাই, করাচি, মাদ্রাজে এই বিদ্রোহের অভ্যুত্থান হয়। জাহাজগুলি থেকে ইউনিয়ান জ্যাক নামিয়ে তোলা হয় তেরঙ্গা, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের ঝাণ্ডা। তাঁদের পেশাগত দাবিতে শুধু বিদ্রোহ ছিল না, বৃহত্তর দাবির লড়াই-এ পৌঁছায় তাদের সংগ্রাম—তাঁরা জয়হিন্দ্ ইনকিলাব জিন্দাবাদ, হিন্দু-মুসলমান এক হও শ্লোগানে দাবি করলেন, আই.এন.এ. সহ অন্যান্য রাজবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ভারতীয় বিমান বাহিনীতেও ব্যাপক অসন্তোষ ও ধর্মঘট দেখা দিল। জব্বলপুর ইন্ডিয়ান সিগন্যাল কোর ধর্মঘট শুরু করলো। নৌসেনাবাহিনীর এই ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানাতে বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট পার্টি এক সাধারণ শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দেয়। তাতে ব্যাপক সাড়া

মিলেছিল। রজনীপাম দত্ত লিখেছেন, ''Bombay trade unions and Communist Party, received a universal response from the Bombay working people on February 22.''[২০] শুধু বোম্বাই-এ এই বিদ্রোহের উত্তাপ আটকে থাকেনি, সারা দেশেই তা ছড়িয়ে পড়ে। সোমনাথ লাহিড়ী লিখছেন, ''ভারতের ইতিহাসে ইহা অপূর্ব। পরাধীনতার শৃঙ্খল চুরমার করবার জন্য ভারতবাসী আর এক মুহূর্ত দেরি করিতে প্রস্তুত নয়। স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের রেখায় রেখায় সেই অগ্নিবাণী আজ সবার চোখে জ্বলন্ত।''[২১]

এই সময়পর্বের আরও উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশে বেশ কয়েকটি রাজ্যে কৃষকবিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। এরই মধ্যে অন্যতম হল তৎকালীন ত্রিবাঙ্কুর (বর্তমান কেরল) রাজ্যের পুনাপ্রা, ভায়লার অঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহ, হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম, বাংলার তেভাগা আন্দোলন এবং মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ওয়ারলি আদিবাসী বিদ্রোহ প্রভৃতি।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান সি.পি. রামস্বামী আয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানকালে ত্রিবাঙ্কুরকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু প্রজাদের পরাধীন রেখেই ছিল তাঁর এই উদ্যোগ। ১৯৪৫-এর জুলাই আগস্ট মাস নাগাদ ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কৃষি ও কারখানার শ্রমিকেরা চাল চিনি গম কেরোসিন, কাপড়ের দাবি জানাতে থাকে। মালিকপক্ষ অস্বীকার করে। শ্রমিকরা বিদ্রোহ করতে শুরু করলে রামস্বামী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহ দমন করতে। কৃষক শ্রমিকদের আন্দোলনে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসে 'নিখিল ত্রিবাঙ্কুর ট্রেড ইউনিয়ন'। ১৯৪৬-এর ২২ অক্টোবর এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে শুরু হয় ধর্মঘট। হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। জমিদারদের দাবি মেনে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে। পুলিশ-সেনার বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম আরও তীব্রতর হল। পুনাপ্রা ভায়লার অঞ্চলে অনেকে প্রাণ হারালেন। যদিও বিপ্লব অসমাপ্ত তবুও শ্রমিক কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অমর হয়ে রইল ভারতের ইতিহাসে।

হায়দ্রাবাদের নিজাম ও তাঁর অনুগামী জমিদার ও দেশমুখদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার কৃষকদের ন্যায়সংগত দাবির পাশে দাঁড়ায় তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি। অন্ধ্র মহাসভা ও স্টেট কংগ্রেসের কিছু সংগ্রামশীল মানুষের উদ্যোগে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ্র শাখার সাহায্যে হায়দ্রাবাদের কমিউনিস্ট পার্টির একটি শাখা গড়ে ওঠে। তারা তেলেঙ্গানার কৃষকদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তেলেঙ্গানার কৃষকদের দাবি ছিল জমি থেকে কোনোরকম উচ্ছেদ মানবো না, বেআইনি বেগার খাটব না, খাজনা দেব না। তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকরা ১৯৪৪ থেকেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের দিকেই এগিয়ে যেতে

চাইছিল। চল্লিশটি গ্রামের কৃষক সমবেত হয়ে দেশমুখ ও তার গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচার সহ্য করেও আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেল। ''কৃষকেরা তাদের হাতে অস্ত্র দেবার দাবিও জানাল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে। কিন্তু তখনকার কেন্দ্রীয় পার্টির নেতৃত্ব তাদের রাশ টেনে ধরল। তেলেঙ্গানার স্থানীয় পার্টি নেতৃত্বও ভয় পেয়ে গেল। পার্টি নেতারা আইনের সীমা ছাড়িয়ে যেতে তখনও প্রস্তুত ছিলেন না।"[২২] তেলেঙ্গানার সংগ্রামী মানুষের মেজাজ বুঝতে তৎকালীন পার্টি ব্যর্থ হয়েছিল। তাই তাদের জনযুদ্ধ বা গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে অনুমোদন দেয়নি। ফলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। অনেক কৃষক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের প্রাণ যায়। এখানেও আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই, তবু মেহনতি জনতার সাহসী প্রত্যয় ইতিহাসে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য বাংলার ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ তৎকালীন বাংলার ষাট লক্ষ কৃষক তিন ভাগের দু-ভাগ আদায়ের জন্য জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া বাংলার প্রতিটি জেলায় এই তেভাগা আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। নেতৃত্বে ছিল কৃষকসভা। ১৯৪৬-এ খুলনার মৌভোগে কৃষকসভার সম্মেলন থেকে এই আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রায় সারা বাংলা জুড়ে বিস্তৃত এই আন্দোলনে ১৯৪৭-এর ২৯ মার্চ পর্যন্ত তিয়াত্তর জন কৃষক মৃত্যুবরণ করেন। এই আন্দোলন ছিল অত্যন্ত সংগঠিত ও শ্রেণিসচেতন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে শুরু হল মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। পরিণত হয়েছিল ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে। পূর্ববাংলা, পাঞ্জাব, বিহারের সঙ্গে কোলকাতাতেও শুরু হয়ে যায় এই দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় ইংরেজ আরও ইন্ধন জোগাল। ''Riots broke out all over the Punjab and soon extended to the north-west frontier Province, and lootings, arson, murder and violence occured on a large scale over a wide area. These successive communal outbreaks had a very unfortunate consequence. The Hindu and Sikhs who had hitherto been strongly in favour of a united India, now gradually came to realise its impracticability, and demanded partition of Punjab and Bengal if the Muslims refused to join the Constitutuent Assembly."[২৩] এই অবস্থায় ভারত বিভাগে সম্মত হওয়া ছাড়া জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে বিকল্প কিছু ছিল না। দাঙ্গার প্রকৃতি পরিধি কোলকাতার সংবেদনশীল

মানুষের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আমি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। কমিউনিস্টরা কি পাকিস্তান দাবির পক্ষে ছিল? সুস্নাত দাশ লিখছেন, ''মুসলিম লিগের পাকিস্তান নামক একটি ইসলামি রাষ্ট্রের চিন্তাধারাকে কমিউনিস্টরা কোনো কালে সমর্থন করেননি বরঞ্চ ভিন্ন মতই পোষণ করে এসেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসমূহের (ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত ন্যায্য দাবির সমর্থক ছিলেন।''[২৪] এই বিষয়টিকে সংবাদমাধ্যম কমিউনিস্টদের পাকিস্তান দাবি বলে প্রচার করেছে। তবে এই বিভ্রান্তির জন্য সংবাদ মাধ্যমকে সবটা দায়ি করাও চলে না। এর জন্য দায়ী ছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। ''এই ভ্রান্তির পশ্চাতে ড. গঙ্গাধর অধিকারী, পি.সি. যোশি, সাজ্জাদ জাহির প্রমুখ নেতাদের চিন্তাধারার অস্বচ্ছতাও কিয়দংশে দায়ি ছিল।''[২৫] এই ১৬ আগস্ট-এর আক্ষেপ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ঝরে পড়েছে। তিনি লিখেছেন, ''আবার ভাবি কেমন করে যখন ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই যে শহর উত্তাল হল গণ অভ্যুত্থানের গরিমায়, সেখানেই তিন সপ্তাহ কাটার আগে ঘটল এমন অমানুষিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যা অকল্পনীয়, যা সবকিছু হিসাবকেই ভেস্তে দিয়েছিল। আমাদের আন্দোলনে নিশ্চয় আছে এমন কিছু দুর্বলতা যা গোড়ার গলদকে আজও পর্যন্ত কেটে বার করে দিতে পারেনি।''[২৬] এমনই সব সাফল্য দুর্বলতা নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে গেছে তার কর্মসূচি রূপায়ণে। আমি আমার গবেষণায় দেখাব সেই সাফল্য সীমাবদ্ধতা কোন কোন ছাপ ফেলেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. দাশ, সুস্নাত, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বামপন্থী ধারা*, যুবশক্তি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৮

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভারত কোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬২৯

৩. তদেব

৪. আহমদ, মুজফ্‌ফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*, এন.বি.এ., কোলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৫৬

৫. তদেব, পৃ. ৩০৬

৬. চন্দ্র, বিপান; ত্রিপাঠি, অমলেশ ও দে, বরুণ, *বস্বাধীনতা সংগ্রাম*, অনুবাদ : ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৭৩, নয়াদিল্লি, পৃ. ১৩৪

৭. তদেব, পৃ. ১৩৬

৮. Dutt, R. Palme, *India Today*, People's Publishing House (P). Ltd., New Delhi, 3rd Edn., p. 360

৯. *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

১০. তদেব, পৃ. ১৬৮
১১. Roy, Subodh (ed), *Communalism in India*, NBA, Kolkata, 1999, p. 78
১২. *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বামপন্থী ধারা*, পূর্বোক্ত পৃ. ৮২
১৩. রণদিভে, বি. টি, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., কোলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২২
১৪. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, *তরী হতে তীর*, মনীষা, কোলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৩৯
১৫. দাশ, সুস্নাত, *ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা*, প্রাইমা পাবলিকেশন, কোলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৬
১৬. তদেব, পৃ. ১০১
১৭. Roy, Subodh (ed), *Communalism in India*, NBA, Kolkata, 1999, p. 64
১৮. *তরী হতে তীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭
১৯. মুখার্জী, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কোলকাতা, পৃ. ১৫৭
২০. Dutt, R. Palme, *India Today*, People's Publishing House (P). Ltd., New Delhi, 3rd Edn., p. 581
২১. লাহিড়ী, সোমনাথ, 'রক্তের ডাক', *স্বাধীনতা* পত্রিকা, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬
২২. *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বামপন্থী ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১
২৩. Mazumdar, RC; RoyChaudhury, H.C. & Dutta, Kalikinkar, *An Advanced History of India*, MacMillan, 4th ed. 1978, reprint 1991, p. 1047
২৪. *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বামপন্থী ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১
২৫. তদেব
২৬. তরী হতে তীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪

গ. বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মার্কসীয় চেতনা

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ভারতে মার্কসবাদ প্রচারিত হওয়ার আগেই ইউরোপের সোস্যালিস্ট চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। রুশো, বেন্থাম, মিল, বেকন, হিউম প্রমুখ চিন্তাবিদদের সমাজতান্ত্রিক ও সমমনোভাবাপন্ন ধারণা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ১৮৩৫-এ প্যারি শহরের এক সাংবাদিক পিয়াঁরে লেরো একটি প্রবন্ধে 'সোশ্যালিজম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ''তারপরে ১৮৩৫ সালে ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সমিতি (Associatation of All Classes of All Nations)-তে আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দটি বহুল প্রচারিত হতে থাকে।''[১] সেই রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহন রায়ের যোগাযোগ ও পত্রালাপের কথা আমাদের অজানা নয়। ''এটাও জানা যে ওয়েন যে ইউটোপিয়ান সোস্যালিজমের কথা বলতেন তা রামমোহনের পছন্দসই ছিল না।''[২] রামমোহন রায় ছাড়াও কেশবচন্দ্র সেন, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ প্রমুখ উনিশ শতকীয় মনীষীগণের মননে সাম্যচিন্তার বিস্তার লাভ করেছিল। কমিউনিস্ট লিগ (১৮৪৭)-এর কর্মসূচি হিসেবে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর দ্বারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। ১৮৫০-এর ৯ নভেম্বর হার্নে সম্পাদিত চার্টিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র 'Red Republican'-এ (The British Socialist newspaper, published from June 22, 1850)'—হেলেন ম্যাকফারলেন (ঊনবিংশ শতকের ব্রিটেনের সাংবাদিক, সমাজতান্ত্রিক এবং নারীবাদী) 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র ইংরাজি অনুবাদ করেন এবং তা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই ভারতে তা প্রচারিত হয়। মূলত ১৮৭০-র পরবর্তী সময়ে বাঙালি মননে সাম্যচিন্তার প্রভাব আরও একটু প্রসার লাভ করে। ''১৮৭০-এ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিভাগের পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ের সাম্মানিক পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়—'হোয়াট ইজ দ্য এইম অব কমিউনিজ়ম? ডেসক্রাইব দ্য স্কিমস প্রোফাউন্ডেড বাই ফ্যুরিয়ের অ্যান্ড সেন্ট সাইমন রেস্পেকটিভ্লি।'[৩]

সন্দেহ নেই এই কমিউনিজম্ মার্কসবাদ থেকে আলাদা। তবুও তৎকালে তরুণ বুদ্ধিজীবী অংশে কমিউনিজম্-এর বার্তা পৌঁছেছিল। এই প্রচার ও প্রসারে তৎকালে কয়েকটি পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন, 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩, সম্পাদনা : অক্ষয়কুমার দত্ত), 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২, বঙ্কিমচন্দ্র), 'ভারত শ্রমজীবী' (১৮৭২, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যা) প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র মার্কসের 'ক্যাপিটাল' বা 'ম্যানিফেস্টো' পড়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে ইউরোপিয়ান সোস্যালিজম্ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। আর তারই অনুপ্রেরণায় তিনি 'সাম্য' লিখেছিলেন। 'সাম্য'-র 'বিজ্ঞাপন' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—''সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে কেহ রাগ করিবেন না। আরও স্বদেশীয় জনসাধারণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।"[৪]

স্বামী বিবেকানন্দ নিজের সম্পর্কে 'সোস্যালিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেন—''I am Socialist not because I think it is a perfect system but half a loaf is better than no bread."[৫]

কার্ল মার্কসও রুটিরুজিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ধর্মকে নয়। স্বামী বিবেকানন্দও মনে করতেন যে ভগবান মর্তে আমাদের দুবেলা দু-মুঠো অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে স্বর্গে আমাকে অনন্ত সুখে রাখবেন একথা আমি বিশ্বাস করি না। (I do not believe in a God who can not give me bread here, giving me eternal bliss in heaven.)[৬]

বিবেকানন্দের চিন্তাচেতনার সঙ্গে মার্কস কথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল নীতির অনেক পার্থক্য আছে। বিবেকানন্দের সাম্যচিন্তা অনেকখানি ভাবকেন্দ্রিক। যদিও 'বর্তমান ভারত' 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গ্রন্থে পিছিয়ে পড়া মানুষের মুক্তির কথা তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। ভারতে মার্কসীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠার আগে বিবেকানন্দের কণ্ঠেই শূদ্র জাগরণের কথা, মন্ত্রবর্জিতদের মুক্তির কথা বেশি করে শোনা গেছে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লব উপনিবেশিক ভারতের মুক্তিকামী মানুষের চেতনায় আলোড়ন তুলল। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাসখন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' সমিতির তরুণরা এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রভাগে ছিলেন তাঁরা তাঁদের কর্মসূচিকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে বিশেষ সময় দিতে পারতেন না আবার বুদ্ধিজীবী অংশ লেনিনের জীবনী বা বিপ্লবাত্মক কর্মসূচিতে এত বেশি আগ্রহী ছিলেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শন চর্চায় ততখানি আগ্রহী ছিলেন না।

গত শতাব্দীর বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিবেকানন্দ অনুজ ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবাসে থাকাকালীন মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯২৪-২৫-এ মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা প্রচারে সক্রিয় অংশ নেন। পাঠচক্র গড়ে মার্কসীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে থাকেন অনুরাগীদের। এই সময় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গোর্কি-চর্চা একটা অন্য মাত্রা আনল। ১৯২২-এ 'হিন্দুস্তান রিভিউ' পত্রিকায় (যার সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যুক্ত ছিলেন) গোর্কির একটি গল্প প্রকাশিত হয়। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালি ভাইয়া', উপন্যাস 'মা', 'ফুলদোল' প্রভৃতি ছোটোগল্পে গোর্কির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে গোর্কি প্রভাবিত না করলেও শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে গোর্কির ঋণ স্বীকার করেছেন। ''শরৎচন্দ্র নির্মম শ্রেণীশোষণের বিষয়বস্তু নিয়ে যে দুটি গল্প লিখেছেন 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' নামে সেও ঐ সময়েই ১৯২২ সালে, 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়; পরের বছর তিনি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে লেখেন 'পথের দাবি' উপন্যাস; তিনি স্বয়ং বলেছেন, অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির কাছে যে ঐ উপন্যাস রচনায় প্রেরণা পেয়েছেন গোর্কির 'মা' উপন্যাস থেকে।''[৭]

ম্যাক্সিম গোর্কি কেবল কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্টদের মধ্যেই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাই নয়, তার বাইরেও অনেক মানুষের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। 'মা' উপন্যাসের একটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাক। নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, ''গত এপ্রিল মাসে ইনসিন জেলে একটি রুশীয় উপন্যাস পড়তে পড়তে ঠিক এই ভাবের প্রতিধ্বনি পেলাম, লেখক একজন নায়কের মুখ দিয়ে রুশ জাতিকে বলছেন—There is still much suffering in store for the people, much of there blood will yet flow, squeezed out by the hands of greed... in this Joy there is a World of strength![৮]

শ্রেণিসচেতন সাহিত্য রচনায় অথবা বিপ্লব পন্থার অন্যতম প্রেরণা হিসাবে গোর্কি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল বাঙালি মননে।

বিশ শতকের বিশ-এর দশকে বাংলাদেশকে কবিতায় আন্দোলিত করেছিলেন নজরুল ইসলাম। অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সব রকমের বৈষম্যের বিরোধী, পরাধীনতার যন্ত্রণার উপলব্ধি

তাঁকে সাম্যবাদী চেতনায় দীক্ষিত করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল ৪৯নং বাঙালি পল্টনের হাবিলদার নজরুল ইসলামের। মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার হাত ধরে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুলের আত্মপ্রকাশ। পরে মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশ পেল 'নবযুগ', 'ধর্মঘট', 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে লাগল 'নবযুগ'-এ। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব নজরুলের মধ্যে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল। 'হেনা' ও 'ব্যথার দান' প্রভৃতি গল্পে 'লালফৌজ'-এর কথা এসেছে। তবে এ বিষয়ে অনেক মতভেদের জবাব দিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন—''এখন কথা হচ্ছে রুশবিপ্লবের প্রতি এবং তার ফলে যে লালফৌজ গঠিত হয়েছিল সেই লালফৌজের প্রতি নজরুলের কোনো সহানুভূতি ছিল কিনা, না শুধু কথায় কথায় তাঁর গল্পে লালফৌজ এসে গিয়েছিল? আবার এমনও অনেক, অবিশ্বাসী থাকতে পারেন যাঁরা বলবেন লালফৌজের উল্লেখ তো গল্পে নেই তাই নিয়ে আবার আলোচনা কেন? আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করতে চাই 'মুক্তি সেবক সৈনের দল' ও 'মহান ব্যক্তি সংঘ' বলতে তাঁরা কি কী বুঝেছেন? আসর কথা হচ্ছে এই রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লব ও লালফৌজের লড়াই নজরুলের মনে সাড়া জাগিয়ে ছিল। তাই সে ইচ্ছে করেই বেলুচিস্তানকে তাঁর গল্পের ঘটনাস্থল করেছিল, কারণ বেলুচিস্তান থেকে সহজেই সোভিয়েৎ দেশের সীমানায় পৌঁছানো যায়।''[৯]

পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় লেবার ও স্বরাজ পার্টির[১] মুখপাত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'লাঙ্গল' (১৯২৫, ডিসেম্বর) পত্রিকা। এই পত্রিকাতেই নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ লক্ষ করা গেল। এখানেই 'সাম্যবাদী' কাব্যের কবিতাগুলি প্রকাশ পায়।

যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্পশকট চলে
বাবুসাব এসে চড়িল তাহাতে কুলিরা পড়িল তলে।

(কুলি মজুর)

'লাঙ্গল'-এ প্রকাশিত 'সর্বহারা' কাব্যের কিছু কবিতায় শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা উঠে এসেছে।

১) আজ জাগরে কৃষাণ সব ত গেছে
কিসের বা আজ ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার
ক্ষুধার জগৎ জয়। (কৃষাণের গান)

২) এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল।
ধর হাতুড়ি তোল, কাঁধে শাবল। (শ্রমিকের গান)

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বোধ হয় বলতে পারি—"মার্কসীয় চেতনার সঙ্গে বাংলা কবিতার সংযোগের রাখীটি নজরুলই প্রথম বেঁধেছিলেন।"[১০]

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর এই পার্টির বেশ কিছু প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বিরুদ্ধে শুরু হয় মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের শাস্তি হয়। দেশের বিভিন্ন জেলে তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যান। আগেই আলোচনা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও তাঁদের আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তাঁরাও বিভিন্ন জেলে ছড়িয়ে যান। তাঁদের মধ্যে 'যুগান্তর' 'অনুশীলন' দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মূলত মিরাট মামলার দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দি মার্কসিস্টদের উদ্যোগে, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আগ্রহে জেলের অভ্যন্তরেই শুরু মার্কসচর্চা। সেই বিপ্লবীদের অনেকেই বন্দিজীবন শেষে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। গোপাল হালদার, রেবতী বর্মন, ভবানী সেন, সরোজ আচার্য এঁদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে মার্কসীয় সাহিত্যচর্চায় ও রাজনীতি প্রয়োগে এঁরা অংশগ্রহণ করেন। যেমন, গোপাল হালদারের গল্প উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলিও মার্কসীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ঠাঁসা। যেমন, 'এ যুগের যুদ্ধ', 'গোপাল হালদারের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', 'নোয়াখালির জিলা ছাত্র সম্মেলন; সভাপতির অভিভাষণ', 'বহুজাতির দেশ সোভিয়েত', 'বাঙালি সংস্কৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থের স্রষ্টা গোপাল হালদার। রেবতী বর্মণের 'কৃষক ও জমিদার', 'তরুণ রুশ', 'ভারতে কৃষক সংগ্রাম ও আন্দোলন', 'মার্কস প্রবেশিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ভবানী সেনের 'মাদার রাশিয়া', 'কৃষকের দাবী' প্রভৃতি গ্রন্থ, সরোজ আচার্যের 'মার্কসীয় দর্শন', 'মার্কসীয় যুক্তি বিজ্ঞান' গ্রন্থগুলি বাংলার মার্কসচর্চার সহায়ক গ্রন্থ। উপরিউক্ত বিপ্লবীদের কথা থেকে জানা গেছে অক্টোবর বিপ্লব কমিউনিজম্ বলশেভিজম্ ইত্যাদি বিষয়ের থেকে মাতৃভূমি উদ্ধারই ছিল তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য; পরবর্তীকালে জন রীডের 'টেন্ ডেজ দ্যাট শুক্ দি ওয়ার্লড' (দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন, অনুবাদ ননী ভৌমিক, এন.বি.এ. বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ছাপা নয়। ভূমিকা—লেলিনের ১৯২৩ সালে রুশ সংস্করণ ছাপা হয় তখন ভূমিকা লেখেন লেনিনের স্ত্রী স্ক্রুপস্কায়া) এবং ১৯২৮-এ প্রকাশিত 'বাঙলার বাণী'। পত্রিকায় 'রাশিয়ার রক্তবিপ্লব'-এর মত গ্রন্থ পাঠের পর তাঁদের মনে হয় স্বাধীনতার লড়াই-এ মজুর, চাষিকে টেনে নামানো দরকার।

১৯৩১-এ প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকা। 'পরিচয়'-কে কেন্দ্র করেই মার্কসীয়

বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এইসব তরুণ-বুদ্ধিজীবীদের ঔদার্যে ও আগ্রহে সুশোভন সরকারের 'রুশবিপ্লবের পটভূমি', 'রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত' ধারাবাহিকভাবে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময় ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা প্রকাশে আরও মার্কসীয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রগাঢ় রূপ দেখা পেল 'পরিচয়'-এ। 'পরিচয় পত্রিকার এরূপ মার্কসীয় চেতনার স্ফুরণ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে হিরণকুমার সান্যাল বলেন (ধূর্জটিপ্রসাদের অথঃ কাব্য জিজ্ঞাসা বিষয়ে) ''মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যায় এই প্রবন্ধটি ঠাসা। তখনকার দিনে এসব কথা নতুন ছিল। ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে ফুটল লালের আভা।...এই সময়ের একটির পর একটি প্রবন্ধে সুশোভন সরকার বর্ণনা করেছিলেন তখনকার ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা। অত্যন্ত সরল ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য এগুলি উল্লেখযোগ্য। অনেকেরই তখন চোখ ফুটেছিল এই লেখাগুলি পড়ে। ...এর কিছুকাল পরে সদ্য বিলেত ফেরত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে যোগ দিলেন পরিচয়ের আড্ডায় ও লেখক গোষ্ঠীতে। পরিচয়ের পাতায় লালের আভা আরও একটু গাঢ় হলো। এই রঙ প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে।''[১১] মোট কথা সাম্যবাদী চিন্তা চেতনার প্রসারে, প্রগতি আন্দোলনের গতিধারা নির্মাণে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 'পরিচয়'। পরিচয় তৎকালীন তরুণ সম্প্রদায়ের এক পরিচিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছিল যে প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্যরা হলেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাহেদ সুরাওয়ার্দি, বিষ্ণু দে প্রমুখরা।

'পরিচয়'-এর আড্ডা সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—''প্রধানত সুধীনবাবুর বাড়িতেই যেতাম, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী কিংবা গিরিজাবাবুর বাড়িতে যে বৈঠক হত সেখানে খুব কমই গিয়েছি। এর অর্থ হল যে ঠিক গোষ্ঠীভুক্ত হতে পরিনি। আড্ডাধারী হবার মত স্বভাবও ছিল না। আর তখন যা আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল সেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হিসাবে লেখক শিল্পীদের নিয়ে প্রগতি প্রয়াসে লিপ্ত ছিলাম বলে পরিচয়ের মত একটি পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ ছিল কর্তব্যেরই মধ্যে।''[১২]

১৯৩০-৩১ এই সময় থেকেই 'পরিচয়'-এর আড্ডা সূত্রে মার্কসীয় চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধি ঘটে কবি বিষ্ণু দে-র। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শুক্রবারের আড্ডা, বিশিষ্ট মার্কসীয় পণ্ডিত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সংস্পর্শ প্রভৃতির সঙ্গে বিষ্ণু দে-র পরিচয় ঘটল। এলিয়ট ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত সূত্রে তাঁর চেতনায় মার্কস অঙ্গীভূত হল। চাষি, মজুররা হাজির হন তাঁর কবিতার পংক্তিতে।''[১৩]

১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। মার্কসবাদ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা তারও আগেই গড়ে উঠেছিল। ১৩৩৮-এর মাঘ-ফাল্গুন-এর

'বিচিত্রা'-য় তিনি 'মস্কৌ চিঠি' নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রুশ দেশের শ্রম ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের উদ্যোগ। ব্যক্তিগত মালিকানার হ্রাস, সম্মিলিত উৎপাদন রীতি তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরও রুশ শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল।

বিশ শতকের তিনের দশকে একটি বিষয় তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আলোড়িত করেছিল তা হল ফ্যাসিবাদের উত্থান। 'ফ্যাসিবাদ' হল একটি রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা, যার মূলে আছে জাতির শ্রেষ্ঠত্ববোধক মনোভঙ্গি। গণতন্ত্র বিরোধী, একদলীয় শাসনে পরিচালিত স্বৈরতান্ত্রিক যান্ত্রিক এক মতবাদ ফ্যাসিবাদ।[১৪]

'New College Dictionary', Houghton Mifflin reference book (ISBN 0618396012) থেকে জানতে পারি—''The term 'Fascimo' is derived from the Italian word 'Fascio' which means 'bundle' or group, and from the Latin word 'Fasces'. The Fasces which consisted of the rods that were tide around an axe, was an ancient Roman Symbol of the authority of the Civic magistrate." ''১৯০৯-১০-এর সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন মুসোলিনী।"[১৫] সমাজবাদের তত্ত্বের বাইরে এসে ১৯১৪-১৬ সালে 'popolo d' Halio' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন, এবং সামরিক শাসনের অন্ধ আনুগত্যের মোহজাল বিস্তার করেন। তৈরি করেন নিজস্ব সংগঠন Fasci d' Azione Revoluzion aria, ১৯১৯ সালে মুসোলিনির লেখাতেই প্রথম 'FASCISMO' শব্দটি প্রথম আসে।

ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদের ঘনীভূত রূপ, স্বদেশের ক্ষমতা বিস্তার, জাতিগত গর্ববোধ, দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার প্রীতি যুদ্ধ সম্পর্কে বীরত্বময় মনোভঙ্গি, কর্মোদ্যমের প্রত্যক্ষতা, পুঁজিবাদী পদ্ধতির সমাজস্থাপত্য এই সব সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র লক্ষণ ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য রূপেও স্বীকৃত।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি তৈরি করেন 'ফ্যাসিস্ত দ্য কম্ব্যাটিমেন্টো' নামে একটি আন্দোলন। দু-বছর পরে ঐ আন্দোলন থেকেই তৈরি হয় ফ্যাসিপার্টি। অন্যদিকে জার্মানিতেও তৈরি হয় 'ন্যাশনাল সোল্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (১৯১৯), সংক্ষেপে নাৎসি দল। ১৯২০ সালে যে দলের নেতা হন 'অ্যাডলফ হিটলার'।

১৯২৬ থেকে ১৯২৯, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩—হিটলার-এ কর্তৃত্ব বিস্তারের সময়সীমা। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্ডেনবার্গ (জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান)-এর মৃত্যুর পর হিটলার জার্মানীর অধিশ্বর হন। ইহুদিদের নাগরিকত্ব লোপ, ইহুদি-অইহুদি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা, ইহুদি বিতাড়ন, গ্যাসচেম্বার, ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে অথবা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নির্বিচারে হত্যা ইত্যাদি

হিটলারের—কর্মসূচির অন্যতম ছিল। খ্রিস্টান জনসমর্থনের জন্য এগুলি তিনি ঘটিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে লিগ অব নেশন্‌স্‌-এর সঙ্গে সম্পর্ক চ্যুতি ঘটে। মুসোলিনির ইথিওপিয়া অভিযান সমর্থন করেন। তারপর তাঁর সঙ্গে জোট তৈরি করে অস্ট্রিয়া, সাডেটেনল্যান্ড চেক সীমান্ত অধিকার করেন, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে পোলান্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন, ফ্রান্স একযোগে বিরোধিতা তথা যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মূলত হিটলার ছিলেন ইহুদিবিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী। হিটলার-মুসোলিনির এই কমিউনিস্ট বিরোধিতা, জাতি বৈরিতা ও আগ্রাসন নীতি প্রগতিশীল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারেন নি। শুধু হিটলার মুসোলিনি নয় স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও জাপানের তোজোও ওই হিটলার মুসোলিনিদেরই অনুসারী ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনির আবিসিনিয়া আক্রমণ, জাপানের চীন আক্রমণ বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারেন নি।

মানবতার শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল সংবেদনশীল মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন রম্যাঁ রঁলা, আঁরি বারবুস প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা। আর তারই প্রয়াস হিসাবে ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রাসেলস্‌-এ প্রথম ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে ভারত থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু। সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের বাণী পঠিত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রম্যাঁ রলাঁ ও আঁরি বারবুসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'গোল্ডেন বুক অব পিস' নামে একটি সংকলন। ঐ সংকলনে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখাও ছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন 'ওয়ার রেজিস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি বিজ্ঞানীদের সংগঠন তৈরি করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন প্যারিসে আবার রম্যাঁ রলাঁ, আঁরি বারবুস, গোর্কি প্রমুখদের উদ্যোগে ফ্যাসি বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। আঁদ্রে জিদ, ই.এম. ফস্টার, হাক্সলি, জন স্ট্রাচি, জুলিয়া বাঁদা, আঁদ্রে মালরো প্রমুখ বরেণ্য সাহিত্যিকরা ওই সম্মেলনে যোগ দেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুলকরাজ আনন্দ। উপরোক্তদের অনুপ্রেরণায় ভারতের বুদ্ধিজীবীরাও অনুরূপ কিছু করা যায় কিনা, সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন। মুলকরাজ আনন্দ্‌, সাজ্জাদ জাহির, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন, ইক্‌বাল সিং, রাজা রাও প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৩৬-এ লখনউ-তে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়। যার সভাপতি হন বিশিষ্ট উর্দু কবি মুন্সি প্রেমচন্দ্‌। এ বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—''লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) দর্শক হিসাবে যোগদানের সুযোগ পাওয়া গেল, কারণ ঐ একই সময়ে মে মাসে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের পত্তন ঘটে।

সাজ্জাদ জাহির দেশে ফিরে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রলাঁ, বারবুসের নেতৃত্বে প্যারিসে লেখক শিল্পীদের বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তখনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুলক রাজ আনন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন। বহু বিতর্কের পর স্থিরীকৃত এক-ইস্‌তেহারের ভিত্তিতে লক্ষ্ণৌতে প্রগতি আন্দোলনের উদ্বোধনী অধিবেশন কংগ্রেস সপ্তাহে হওয়ায় বেশ সাড়া পড়ে। অংশগ্রহণ যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য সরোজিনী নাইডু, উর্দু সাহিত্যের দিক্‌পাল মুন্সি প্রেমচন্দ্‌ ও আর একাধারে রাজনৈতিক নেতা মৌলানা হজরত মোহানি।"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৩৫-এ মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া ও ১৯৩৬-এ ১৮ জুলাই ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে ফ্যাসিস্টশক্তির অভ্যুত্থান ঘটলে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সি.এস.পি. (কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি) পারিচালিত ট্রেড ইউনিয়ানগুলি তীব্র ঘৃণায় ফেটে পড়ে। শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হন বুদ্ধিজীবীরা। ১৯৩৫-এর ২৭ অক্টোবর কলকাতায় একটা ঘরোয়া সভায় যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

১৯৩৬-এর ১৮ জুন গোর্কির মৃত্যু হয়। AIPWA (All India Prograssive Writers Association) গোর্কি দিবস পালনের ডাক দেয়। তার আগেই বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ১৯৩৬-এর ১১ জুলাই এলবার্ট (কলকাতা) হলে একটি শোকসভার আয়োজন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, খগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—''ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুর পর দেশজুড়ে গোর্কি দিবস পালনের যে আহ্বান, সংঘ দেয় তাকে 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে কমিউনিস্ট দৌরাত্মের এক নিদর্শন বলে প্রচার চালানো হয়।[১৭] কোলকাতার ঐ এলবার্ট হলের গোর্কির ঐ স্মরণ সভা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সংঘ স্থাপন রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন। তিনি 'প্রলয়ের সৃষ্টি' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হতে পারে না। তাহলে মানুষ বাঁচতো না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ, তবু তার বড় বড় কামনা মরে নি।... মানুষের ইতিহাসের অন্তরে যদি মহতের কোনো স্থান না থাকতো তবে মানুষের ইতিহাস এত অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণশীল থাকতো না। আজকের দিনে এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে এই-ই মানুষের আশ্বাস বাণী।[১৮]

কবি বুদ্ধদেব বসুও মতাদর্শগত ভিন্নতা সত্ত্বেও সভ্যতার বিপদে তিনি তৎকালীন

বামপন্থীদের কাছাকাছি এসেছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর একটি লেখাতেই এই মতের সমর্থন মিলবে। তিনি লিখেছেন—

> অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসিজমের ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাব না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু, সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেই জন্য আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে।[১৯]

তৎকালীন সময়ের বামপন্থী ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্ত-র কথা-ভাষ্যে উঠে এসেছে ফ্যাসিবাদের বিপদের কথা। তিনি লিখেছেন—

> ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদকে জন্ম দেয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে অবক্ষয়ের মধ্যে ফ্যাসিবাদের জন্ম। শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্রে বিজয়ী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গ্যারান্টি সৃষ্টি করা যায়। এবং ফ্যাসিবাদের কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়।[২০]

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক' সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৮-এর ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর আশুতোষ কলেজের সভাকক্ষে। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখেরা ছিলেন এই সম্মেলনের আয়োজক। ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রগতি মনোভাবাপন্ন লেখকেরা এই সম্মেলনে যোগ দান করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হিরণকুমার সান্যাল, আব্দুল হালিম, সাজ্জাদ জাহির, বলরাম সাহানি প্রমুখ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করে এবং রাশিয়া আক্রমণ করে। কমিউনিস্টরা দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে রাস্তায় নামেন। ১৯৪১ সালের 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠিত হয়। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হন এই সমিতির সভাপতি ও স্নেহাংশু আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নেন সম্পাদকের দায়িত্ব। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ ঐ সমিতির ব্যানারে ঢাকায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সম্মেলনের আয়োজকদের অন্যতম সংগঠক সোমেন চন্দ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র আক্রমণে নিহত হন। আরও উত্তাল হল আন্দোলন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (BPSF) এই সূত্রে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন আহ্বান করে। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এইভাবে—'An Anti-Fascist Conference of the well known writers and Journalist of Bengal will be held to day (Sunday) al 5p.m. in the University Institule Hall. Ramananda Chatterjee will preside. Sjts Atul Gupta, Satyandra Mazumder, Buddhader Bose, Suren Goswami, Prenendra Mitra, Pramathanath Bisi, Hirendranath

Mukherjee, Gopal Halder, Saroj Dutta, Sajanikanta Das, Nihar Ray, Bishnu Dey, Nilima Devi will address."[২১]

'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ'-র দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল-এ ১৯৪৪-এর ১৫, ১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চিত্রকর সাংবাদিক আব্দুল মনসুর আহমেদ, গোপাল হালদার, গীতিকার শচীনদেব বর্মন। ''Messages came from the All India P.W. Association, from S.S. Chauhan (reprensing P.W.A. of U.P.) from Dakshinaranjan Mitra Mazuder, the creater of children's literature in Bengal, from a writer in the Airforce (Bill Butler, or Davil Martin, British Communist Pilots) from the provincial Trade Union Congress and the Kisan Sabha."[২২]

সম্মেলনে যে কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদক নির্বাচিত হন যুগ্মভাবে—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও গোলাম কুদ্দুস। ''১৬ তারিখ (১৯৪৪) শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক উৎসব, রংপুর, জলপাইগুড়ি, শিলেট, ঢাকা, খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশপরগণা, বরিশালের লোক শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিতের পাঁচালি, এই প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণা ৪৬নং ধমতলা স্ট্রীট তখন জমজমাট। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আমাদের বিরাট অনুষ্ঠান হলো মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে; বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে মনে আছে, পানু পাল ও রেবা রায়ের 'ভুখানৃত্য' বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী' বিনয় রায়ের গান 'ম্যায় ভুখা হুঁ'। ...নির্মল চৌধুরীর নেতৃত্বে 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান' প্রভৃতি গান গেয়েছিলাম আমরা।"[২৩] সুধী প্রধান লিখেছেন—''The Conference concluded on January 17, with another cultural restival at Minerva Theatre, which was inaugurated by a leading dramatist Sachin Sengupta. A part from the items noticed before, the feature of the evening was Bijon Bhattacharya's 'Jabanbandi', the most successful play on food crisis which we have got so far."[২৪]

'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৪-এ এই সম্মেলনের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছিল। মূল সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অভিভাষণে বলেন, ''...যুগেযুগে মানুষের কল্যাণ, মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্নভাবে

মাথা তুলিয়াছে, শিল্পীরাও তাহাতে বাধা দিয়াছে। আজ সেই শক্তি নতুন নাম নিয়ছে তাই তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের নতুন নামে অভিযান ঘোষিত হইবে। ফ্যাসিস্ত বিরোধী নামের সার্থকতা এইখানে। ফ্যাসিজম মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতের শত্রু। দেশব্যাপী দুঃখ ও বিপদের মধ্যে আর সকলের সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরও কাজ করিবার আছে। ইহা স্মরণ করিয়াই এই সংঘবদ্ধতা। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীর স্বধর্ম।"[২৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বোপরি কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারে যে-সব পত্রিকা সরব হয়েছিল, তা হল 'অগ্রণী', 'অরণি', 'জনযুদ্ধ' প্রভৃতি।

■ অগ্রণী

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-র দ্বিতীয় সম্মেলন। ''পূর্ব প্রস্তুতি থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে এই সম্মেলনের শুভ ফলস্বরূপ প্রকাশিত হলো ১৯৩৯-এর জানুয়ারি মাসে 'অগ্রণী' মাসিক পত্রিকা। বাংলা ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা হলো 'অগ্রণী'।"[২৬] 'অগ্রণী'-র সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্ল রায়। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন দেবকুমার গুপ্ত, অদ্বৈত দত্ত, বীরেন্দ্র মজুমদার ও চিন্মোহন সেহানবিশ। অল্প দিনের মধ্যেই 'অগ্রণী' সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে যুক্ত হন সরোজ দত্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, অনিল কাঞ্জিলাল, শ্যামনাথ সিংহ।

তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের লেখায় পুষ্ট ছিল 'অগ্রণী'। ধনঞ্জয় দাশ সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন—''মানব মুক্তির সংগ্রামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবজগতে প্রবাহিত তৎকালীন প্রগতিমুখী সমস্ত ধারার প্রতিফলন ঘটেছিল 'অগ্রণী'-র প্রতিটি সংখ্যার প্রত্যেকটি রচনায়। সোমনাথ লাহিড়ী, আব্দুল হালিম, রণেন সেন, ভবাণী সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. জি (গঙ্গাধর) অধিকারী, অজয়কুমার ঘোষ. পি.সি. যোশী, অর্জুন অরোরা, ডি.ডি. কোশাম্বী, চিন্মোহন সেহানবিশ, করুণাকরগুপ্ত, নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মনোরঞ্জন রায়, সুধী প্রধান, সরোজ দত্ত, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ইউরোপের 'New Writing'-আন্দোলনসহ র‍্যালফ ফক্স কডওয়েল, সিলোন, এডওয়ার্ড আপওয়ার্ড প্রমুখের রচনাক অনুবাদ কিংবা পরিচিতিমূলক রচনাবলী আমার উপযুক্ত কথার সত্যতা প্রমাণ করে।"[২৭]

■ অরণি

১৯৪০-এর জুন মাসে 'অগ্রণী'-র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 'অগ্রণী'-র শূন্যস্থান পূরণ করে 'অরণি'। ১৯৪১, ২২-এ আগস্ট, শুক্রবার 'অরণি' প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত আক্রান্ত হয় জার্মানির দ্বারা ঐ বছর। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে তোলপাড় গোটা বাংলা, তৈরি হয়েছে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী' আর এই সময়ের গঠিত হচ্ছে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' আর এই সময়ের তাগিদেই আত্মপ্রকাশ 'অরণি'-র। পত্রিকাটির দায়িত্ব নেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সহকারী হিসাবে পেয়েছিলেন, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্তকে। কবি অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য অনিল কাঞ্জিলালরাও যুক্ত ছিলেন। ''কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'জনযুদ্ধ' প্রকাশের আগে এই 'অরণি' পত্রিকা একদিকে যেমন ছিল বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের অঘোষিত মুখপাত্র, অন্যদিকে তেমনি 'অরণি'-র পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হত ফ্যাসিস্ত বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সকল তাৎপর্য আর সৃজনশীল সাহিত্যিকদের নানা রচনা। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মত বিপ্লবী কবিসহ অনেক তরুণ প্রতিভা এই 'অরণি' পত্রিকার পৃষ্টাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।''[২৮] স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'অনামী' ছদ্মনামে 'কথাপ্রসঙ্গে' নামে একটি ফিচার নিয়মিত লিখতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমেন চন্দের বিভিন্ন গল্প, বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী' এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'নবান্ন' এই 'অরণি'-তেই প্রকাশিত হয়। অরণি দীর্ঘায়ু হয়নি। সাত বছরের কিছু সময় চলার পর তার সমাপ্তি (১৯৪৮) ঘটে। হয়তো এটাই ছিল এক অনিবার্য পরিণতি। যুগের দাবি মেটাতেই 'অরণি'-র আত্মপ্রকাশ। প্রয়োজনের অবসানেই তার ইতি।।''[২৯]

■ জনযুদ্ধ

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অবস্থান যে 'জনযুদ্ধ নীতি', তারই মুখপত্র ছিল এই 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা। কি ছিল এই জনযুদ্ধনীতিতে? বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের-এর জার্মানি পোলান্ড আক্রমণ করে, তার পরই—ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ভারতও স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশ হিসাবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ হিসাবে গন্য হয়। সি.পি.আই বলে এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'না এক পাই না এক ভাই' স্লোগান তোলে কমিউনিস্টরা। পরবর্তীকালে সোভিয়েতের সঙ্গে হিটলার অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে ১৯৪১ সালে সোভিয়েত আক্রমণ করে, নাৎসি বাহিনির কদর্যরূপ পৃথিবী লক্ষ করে। আর তখন কমিুনিস্টরা তাদের জনযুদ্ধ নীতি ঘোষণা করে। (১৯৪১-এর ১৫ ডিসেম্বর) 'জনযুদ্ধ' নীতি অনুযায়ী ফ্যাসিবিরোধী, সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার

পাশাপাশি ''৫৫নং পার্টি চিঠিতে সি.পি.আই. ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে যে, সব দাবি উত্থাপন করেছিল তাহল—

ক) ভারতের স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ) গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গ) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

ঘ) জনপ্রিয় প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।''[৩০]

জনযুদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, বঙ্কিম মুখার্জি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল আত্মপ্রকাশ করে এই পত্রিকা। চলেছিল ১৯৪৬-এর ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি 'জনসাধারণের সাপ্তাহিক পত্রিকা' হিসাবে প্রকাশ পেলেও পরবর্তীকালে পার্টির উপর নিষেধজ্ঞা (১৯৪২, ২রা সেপ্টেম্বর) উঠে গেলে ''কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল।''[৩১]

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলন, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েতের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে গড়ে উঠেছিল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' ও 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' দুইয়েরই কার্যালয় ছিল ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটের দোতলা বাড়িতে।

চিন্মোহন সেহনবিশ লিখছেন,—'সেদিনকার জটিল অবস্থাতেও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছুটা দাগ কাটতে পেরেছিল কারণ একদিকে ভারতবাসীর গভীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও অন্যদিকে কিছু মহাপ্রাণ নেতা ও কর্মীর অশ্রান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা। এদের মধ্যে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রথমেই স্মরণ করি ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়দের।''[৩২] তিনি আরও এ-বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন—

> ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের জন্ম ১৯৪২ সালে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের একটি শাখা ছিল বাঙলাদেশে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতেই নিখিলভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় সাড়ম্বরে। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুণ ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল একেবারেই। যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তার পুনরুজ্জীবন ঘটল সেটি হচ্ছে দেশে ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের হাতে ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দের অপমৃত্যু (৮ই মার্চ ১৯৪২)। ঐ মৃত্যু সেদিন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বাঙালী লেখকদের। ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ যে, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, তাতে যোগ দিলেন বহু বাঙালি লেখক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে, যাঁরা এতে যোগ দেন, তার মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, ড. অমিয় চক্রবর্তী, আবু সইদ আইয়ুব প্রমুখের নাম মনে পড়ছে।[৩৩]

৪৬নং ছিল বামপন্থী চিন্তাপ্রসারের অন্যতম কেন্দ্র। সুকান্ত ভট্টাচার্যের ফ্যাসি বিরোধী কবিতা, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' ৪৬নং এই প্রথম এসে পাঠ করেন। এ রকম বহু ঘটনা চিন্মোহন সেহানবিশ স্মরণ করেছেন—

> এই বুধবারের বৈঠকে ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস, সুলেখা সান্যাল প্রভৃতি অনেকে তাঁদের নতুন লেখা পড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবীন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় থেকে শুরু করে বিমলচন্দ্র ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী ও নরেন মিত্রের মতো মাঝারিরা, এবং অমল দাশগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর মতো তরুণেরা অনেকেই তখন যোগ দিতেন এই আসরে। আর বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও সুপরিচিত 'নবান্ন' নাটক, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্রের তিনটি নাটকের প্রাথমিক খসড়া পড়া হয় ৪৬নং-এই।[৩৪]

এই সময় পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্টাল অরগাইজেশন হিসাবে কাজ করত 'গণনাট্য সংঘ', 'মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি', 'পিপলস রিলিফ কমিটি', 'ছাত্র ফেডারেশন', 'কিশোর বাহিনী'। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। 'প্রগতি লেখক সংঘ' থেকেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের জন্ম এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'গণনাট্য সংঘ'। ''মন্বন্তরের কার্যকারণ, শত্রু মিত্র নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছিল শিল্প সাহিত্যে স্বাভাবিক এবং সচেতন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। সেই পটভূমিতে আমরা দেখতে পেয়েছি নিম্ন বর্গের মানুষদের এবং 'গণ'—এই শব্দটি যাঁদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। গ্রাম বাঙলার সেই ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর, প্রান্তিক চাষী, কামার-কুমার, তাঁতী জেলে, ছুতোর, মুচি, কারিগর,—বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, মধ্যবিত্ত জীবনেও যেভাবে নেমে এসেছে করুণ এক আর্থিক বিপর্যয়—মূল্যমান পরিহৃত অবস্থা, সেগুলিই প্রতিফলিত হচ্ছিল—গানে কবিতায়, উপন্যাসে ও নাটকের মধ্যে।''[৩৫]

'গান' আর 'নাটকের' মিশ্রণ ঘটেছিল ছিল এই ধারায়। লোকসঙ্গীত, কবিগান, পাঁচালি, তরজা, কীর্তন নতুন আঙ্গীকে প্রাণধারণ করল। কৃষক শ্রমিকের সমস্যা উঠে এল গানের ঐ ধারাগুলিতে। নিবারণ পণ্ডিত, হলধরজি, টগর অধিকারী, রমেশ শীল, শেখ গোমানি, ফণি বরুয়া, রাইমোহন, নির্মল দাস, লম্বোদর চক্রবর্তী, নগেন সাহা, উদাসী ফকির, সাহেব আলি, কৃষকনেতা জিতেন সেন, সতীশ মণ্ডল, বাউল গায়ক অখিল চক্রবর্তী. মন্মথ দাস, ধনেশ্বর চৌহান, চন্দ্র সরকার, কাঙাল দাস, বঙ্কিম সেন, ট্রাম শ্রমিক দশরথলাল, মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক কবি গুরুদাস পাল প্রমুখ মৃত্তিকা সংলগ্ন গায়কদের কর্মযজ্ঞে মিশেছিলেন, ''শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

বুদ্ধিজীবী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, সাধন দাশগুপ্ত প্রমুখরা। পাশাপাশি বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ি (বনস্পতি গুপ্ত নামে নাটক লিখতেন), জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের মতো নাট্যকার, অভিনেতারা ছিলেন তাঁদের নাটক নিয়ে।"[৩৬] ১৯৩৪-৪১ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন নিষিদ্ধ ছিল। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন, ''১৯৪০ সনে বাংলাদেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গেল। আমাদের কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একদিন আমায় এসে বলল, 'এই দ্যাখ, কী লিখেছি।' ...দেখলাম বেশ কয়েকটি গান ...গানগুলির নামকরণ করল—'নবজীবনের গান।' সেই গানগুলি বহু অনুষ্ঠানে পরিবেশন করতাম দল বেঁধে। তারপর আমাদের বিজন ভট্টাচার্য একটি নতুন নাটক লিখে সবাইকে নিয়ে নেমে পড়লেন সেই নাটকটির অভিনয় দেখাতে—নাটকটির নাম 'নবান্ন'। এতে নানা ভূমিকায় অভিনয় করতেন বিজন নিজে, তাছাড়া গোপাল হালদার, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি ভাদুড়ী (এখন মিত্র), শোভা সেন, অনু দাশগুপ্ত, সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, হরিপদ কুশারী, রবীন্দ্র মজুমদার এবং আরো অনেকেই। ...গণনাট্য সংঘের ইতিহাস হয়ত অনেকেই লিখেছেন অথবা লিখবেন। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি বইয়ে গণনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। তাঁর বইটির নাম হল 'তরী হতে তীর।' সেই দিনগুলিতে অনেক প্রতিভাবান শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন ও বোম্বাই-এর পৃথ্বিরাজ কাপুর, বলরাজ সাহানীর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।"[৩৭]

ফিল্মেও ফুটে উঠেছিল প্রগতি ভাবনা। উদ্যোগ ছিল গণনাট্য সংঘের, ৪৬নং-এর আলোচনায় সেই প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। চিন্মোহন সেহানবিশ জানাচ্ছেন—''বাঙালা দেশে প্রগতিশীল ফিল্ম তোলার সমস্যাও আলোচিত হয় কয়েকটি বৈঠক। 'ছিন্নমূল'-র পরিচালক নিমাই ঘোষ এবং শম্ভু মিত্র তাঁদের ফিল্ম তোলার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন এমনই দুটি আসরে। সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ যাঁরা পরে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি' গঠনে উদ্যোগী হন, তাঁরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন মনে পড়ে। ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনেরও একসময়ে যাতায়াত ছিল ৪৬নং-এ। ভাল বিদেশী ফিল্ম বিশেষ করে সোভিয়েত ফিল্ম আনানোর ব্যাপারে উদ্যোগী ছিল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি।' ...আর বাঙলা—ফিল্মের বিশিষ্ট অভিনেতা, অভিনেত্রীদের মধ্যে শোভা সেন, উৎপল দত্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস প্রভৃতির সঙ্গে ৪৬নং-এর যোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।"[৩৮] প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনোভঙ্গিতে মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিজেকে মজুর শ্রমিক

শ্রেণির কবি বলে তো ঘোষণা করেই ছিলেন।

''বিশের দশকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর (প্রেমেন্দ্র মিত্র) কবিতা—'বেনামী বন্দর', 'পাঁওদল', 'মানুষের মানে চাই' 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'দেবতার জন্ম হল'—প্রতিটিতেই দেখা যায়—মানবসভ্যতা, শ্রেণি বিভক্ত সমাজ, ঔপনিবেশিকতা, পুঁজিবাদের শোষণ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। তাঁর ধারণা ছিল অনেকটাই সমাজতন্ত্রবাদী বীক্ষণের অনুসারী।''[৩৯]

পূর্বে বিষ্ণু দের সাম্যভাবনা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে। ৩০-এর দশকের কবিদের অন্যতম ছিলেন বিষ্ণু দে। মার্কসীয় দর্শন আত্মস্থ করেছিলেন। কবিতায় 'পোড়োভূমি'-র বাস্তবতার পাশাপাশি এসেছে মার্কসীয় ছোঁয়া। সমসাময়িক রাজনীতি উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানির ক্ষমতা দখল করে, ঐ বছরই 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর প্রকাশ ঘটে। ১৯৩৬-এ স্থাপিত হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'—ঐ বছরই চোরাবালি কবিতার প্রকাশকাল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক কৃষক আন্দোলন, পূর্ণ স্বরাজের দাবি, চট্টাগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের উত্থান প্রভৃতি ঘটনাক্রমে বুদ্ধিজীবী মন চঞ্চল। এরকমই এক প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে বুদ্ধিজীবীরা তাঁর প্রকৃত মতাদর্শকে সন্ধান করেছেন। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তৎকালীন পার্টি নেতৃত্বের বিতর্ক, মতবিরোধ দেখা গেছে বারবার, তবুও তিনি মার্কসীয় প্রত্যয় থেকে সরে আসেননি। ''বিষ্ণু দে-র মার্কসীয় বীক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বারবার।''[৪০]

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয় আমার চড়া
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার? (ঘোড়সওয়ার; চোরাবালি)

১৯৩৭-এ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনা প্রগতি সংকলন প্রকাশিত হলে তাতে বিষ্ণু দে লেখক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৪৬-এর মে মাসে খুলনা জেলার মৌভোগ গ্রামে বঙ্গীয় কষৃক সভার নবম সম্মেলন থেকে তে-ভাগা আন্দোলনের সূচনা হয়। একদিকে তেভাগা, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংবেদনশীল সমাজকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। তেভাগা আন্দোলন উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, যশোহর-খুলনায় ছড়িয়ে পড়ে। বিষ্ণু দে লেখেন তাঁর বিখ্যাত 'মৌভোগ' কবিতা। তেভাগা আন্দোলন, গান, কবিতা ছাড়াও কথাসাহিত্যে ও—তার ছাপ রেখে গেছে। সৌরি ঘটকের 'কমরেড', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', সাবিত্রী রায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পাকাধানের গান'-এও তেভাগা আন্দোলন প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তেভাগা-র প্রেক্ষাপটে সৌরি ঘটকের আলোচনা প্রসঙ্গে সুস্নাত দাশ

মন্তব্য করেছেন—''পঞ্চাশের দশকের কয়েকটি উপন্যাসে তেভাগা কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতালব্ধ ছাপ পড়েছিল, কিন্তু পুরোদস্তুর তেভাগা কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাস লেখার প্রথম কৃতিত্ব সৌরী ঘটকের।''[৪১]

তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। স্বাধীনতা পত্রিকার সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে রিপোর্টিং-এর জন্য মালদা গিয়েছিলেন। এই কর্মউদ্দীপনা ও জীবন প্রত্যাশা মঙ্গলাচরণের কবিতায়—

> এই বাংলাদেশ। এর স্বপ্ন শেষ। এর প্রাণ জ্বালায়
> সব পঙ্গপাল। ভাই ধান সামাল। ভাই মান সামাল।।
>
> (উদ্ধৃত : *মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার ধারা*, সুমিতা চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় দাশ (স.), *অনুষ্টুপ*, পৃ. ৩২৭

হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন—

> ১৯৪৬-৪৭-এ তেভাগা আন্দোলনের সময় সলিল লিখেছিলো তার বিখ্যাত 'হেই সামালো হেই সামালো' গানটি। কাকদ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে বিনয় রায় তাঁর অসামান্য গানটি রচনা করেছিলেন : 'অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না'। এই সময় আমি লিখেছিলাম : ''তোর মরাগাঙে আইল এবার বান/ওরে ও কিষাণ / তোর মরা গাঙে আইল এবার বান।''[৪২]

১৯৩৭ সালে রচিত হয় দিনেশ দাসের 'কাস্তে'। সরকারের ভয়ে কোনো সম্পাদক কবিতাটি ছাপতে রাজি হননি। ১৯৩৮ সালে 'আনন্দবাজার রবিবাসরীয়' পাতায় কবিতাটি প্রকাশিত হয় বন্ধু অরুণ মিত্রের সৌজন্যে। 'কাস্তে' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি মহলে যথেষ্ট সাড়া পড়ে যায়।

> বেয়নেট হোক যত ধারালো
> কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!
> ... ...
> বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
> তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
> চাঁদের শতক আজ নহে তো
> এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে।

দিনেশ দাসের চাঁদের রূপক অনেককে প্রভাবিত করেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'বুর্জোয়াদের মায়া' বলেছেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে পোড়া রুটির তুলনা টেনেছেন।

১৯৪২-এর মার্চ-এ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্ত

থেকেই বেশ কয়েকজন প্রতিভাধর কবিকে আমরা পেলাম। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কবিরূপে পরিচিত হয়েছিলেন আগে থেকেই। কিন্তু এই সময়ে অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যাল প্রমুখ।

১৯৩৯-এ 'অগ্রণী' পত্রিকার পাতার সাম্যচিন্তাপ্রসূত কাব্য কল্পনার ছাপ পেলাম অরুণ মিত্রের কবিতায়—

এখন প্রহর গোনো।
উপসী হাতে হাতুড়িরা উদ্যত
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার
দেবতার ক্রোধ কুৎসিৎ রীতিমতো
মানুষেরা হুঁশিয়ার।
লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো
নতুন ইস্তাহার (লাল ইস্তাহার, *প্রান্তরেখা*)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন—

প্রিয়, ফুল খেরবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদে স্যাঁকে চামড়া।

অথবা 'পোড়া মাটি', 'স্বাধীনতা', 'অগ্নিকোণ', 'খোলা চিঠি'-র মতো কবিতা। সেখানে ফুটে উঠেছে মুক্তি সংগ্রামের কথা, স্ট্রাইক, কারখানা শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলন, রোমান্টিকদের ব্যঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন', 'রানার', 'ছাড়পত্র' প্রভৃতি কবিতায় মার্কসীয় দায়বদ্ধতার কথাই ঘোষিত হয়েছে।

১৯৪৬-এর জটিল-কুটিল সময়ে বাংলা কবিতার আসরে এসেছেন একঝাঁক তরুণ কবি। যাঁদের কবিতায় এসেছে, দাঙ্গা, দেশভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতার কথা। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, অসীম রায়, দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, সানাউল হক, জ্যোতি রায় প্রমুখ।

এইভাবেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মার্কসীয় চেতনা ফলবান হয়ে উঠেছিল। ওই সময়ে পর্বে আজও বিভিন্ন অবয়বে সেই ধারা অব্যাহত, যদিও বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা আছে। ওই সাহিত্য সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় আমরা দেখব একটা সময়পর্বের বেশ কিছু উপন্যাসে কীভাবে মার্কসীয় চেতনা দানা বেঁধেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. রায়, অনিলচন্দ্র, 'সোশ্যালিজম এবং কমিউনিজম', *বাঙালির সাম্যবাদ চিন্তা*, শিপ্রা সরকার, অনমিত্র দাশ (স.) আনন্দ পাবলিকেশ, কোলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯১

২. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'বাঙালি-সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, দত্ত, হর্ষ ও বসু, স্বপন (স.), পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৪

৩. দাশ, সুস্নাত, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বামপন্থী ধারা*, যুবশক্তি প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০৫, প. ৭

৪. *বঙ্কিম রচনাবলী*, শুভম, কোলকাতা, ২০১২, পৃ. ১২৩১

৫. *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Advaita Ashrama, Kolkata, 1955, Vol. 6, p. 348
সূত্র : ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, *বাঙালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী চিন্তাধার প্রভাব, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, দত্ত, হর্ষ, স্বপন, বসু (স.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৫

৬. *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vedanta Press and Book Shop, USA, Vol. 8, p. 476
সূত্র : ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, *বাঙালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদী চিন্তাধার প্রভাব, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, দত্ত, হর্ষ, স্বপন, বসু (স.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৫

৭. ঘোষ, সত্যপ্রিয়, 'বাংলা সাহিত্যে গোর্কির প্রভাব ও নতুন চেতনার সূচনা', *বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা*, ধনঞ্জয় দাস (স.), অনুষ্টুপ, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৬১

৮. বসু, সুভাষচন্দ্র, 'তরুণের স্বপ্ন', গোড়ার কথা প্রবন্ধ, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কোলকাতা, ১৩৪৫ ব. পৃ. ১৫

৯. আহমদ, মুজফ্ফর, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০৫

১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারা', *বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার-ধারা*, ধনঞ্জয় দাশ (স.), অনুষ্টুপ, ১৯৯২, কোলকাতা, পৃ. ৩০১

১১. সান্যাল, হিরণকুমার, *পরিচয়ের কুড়ি বছর অন্যান্য স্মৃতিচিত্র*, প্যাপিরাস, কোলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৮৭

১২. ঘোষ, শ্যামলকৃষ্ণ, *পরিচয়-এর আড্ডা*, কে.পি. বাগচী, কোলকাতা, ১৯৯০, ভূমিকাংশ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩. দাশ, সুস্নাত, 'প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কয়েকটি সাময়িক পত্রের ভূমিকা', *বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার-ধারা*, ধনঞ্জয় দাশ (স.), অনুষ্টুপ, ১৯৯২, কোলকাতা, পৃ. ৪৩৩

১৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'ফ্যাসিবাদ বিরুদ্ধতা ও বাংলা ছোটগল্প', *যুবমানস*, সৌমিত্র লাহিড়ী (স.), কোলকাতা, জুলাই, ১৯৯৫, পৃ. ৭১

১৫. তদেব, পৃ. ৭১

১৬. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, *তরী হতে তীর*, মনীষা, ১৯৭৪, পৃ. ২৪৩

১৭. তদেব, পৃ. ২৪১

১৮. চক্রবর্তী, রথীন, *প্রলয়ের সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম*, লোকমত প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১০

১৯. বসু, বুদ্ধদেব, 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম', *বাঙালির সাম্যবাদ চিন্তা*, সরকার শিপ্রা, দাশ, অনমিত্র (স.), আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫২
২০. দত্ত, রজনীপাম, 'ফ্যাসিবাদ এবং সমাজবিপ্লব', *ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম*, রথীন চক্রবর্তী (স.), লোকমত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৭
২১. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ২৮ মার্চ, ১৯৪২
২২. Pradhan, Sudhi (ed.), *Marxist Cultural Movement in India*, National Book Agency, Kolkata, p. 265
২৩. বিশ্বাস, হেমাঙ্গ, *উজান গাঙ বাইয়া*, অনুষ্টুপ, ১৯৯০, কোলকাতা, পৃ. ৮৮
২৪. Pradhan, Sudhi (ed.), *Marxist Cultural Movement in India*, National Book Agency, Kolkata, p. 267
২৫. 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৪ : উদ্ধৃত 'ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা', দাশ, সুস্নাত, প্রাইম পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৯২
২৬. দাশ, সুস্নাত, 'প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কয়েকটি সাময়িক পত্রের ভূমিকা', *বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার-ধারা*, ধনঞ্জয় দাশ (স.), অনুষ্টুপ, ১৯৯২, কোলকাতা, পৃ. ৪৫০
২৭. দাশ, ধনঞ্জয়, *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, করুণা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১২
২৮. তদেব, ১৬
২৯. দাশ, সুস্নাত, 'প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কয়েকটি সাময়িক পত্রের ভূমিকা', *বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার-ধারা*, ধনঞ্জয় দাশ (স.), অনুষ্টুপ, ১৯৯২, কোলকাতা, পৃ. ৪৬৫
৩০. 'জনযুদ্ধ' ফ্যাসিবিরোধী পত্রিকা, বেরা, অঞ্জন, *যুবমানস*, সৌমিত্র লাহিড়ী (স.), কলকাতা, জুলাই, ১৯৯৫, পৃ. ২৮
৩১. তদেব, পৃ. ২৯
৩২. সেহানবিশ, চিন্মোহন, *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৫
৩৩. তদেব, পৃ. ৯
৩৪. তদেব, পৃ. ১১
৩৫. রায়, কুমার, 'গণনাট্য একটি মিথ', *বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা*, ধনঞ্জয় দাশ (স.), অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২২১
৩৬. তদেব, পৃ. ২২৫
৩৭. বিশ্বাস, দেবব্রত, *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫ ব., পৃ. ৬০
৩৮. সেহানবিশ, চিন্মোহন, *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৯
৩৯. চক্রবর্তী, সুমিতা, *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬২
৪০. মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, *বিষ্ণু দে*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০০১, পৃ. ৭৩
৪১. দাশ, সুস্নাত, 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রভাব ও প্রতিফলন', *ক্রান্তি পত্রিকা*, এপ্রিল, ১৯৯৭, পৃ. ২২
৪২. বিশ্বাস, হেমাঙ্গ, *উজান গাঙ বাইয়া*, অনুষ্টুপ, ১৯৯০, কোলকাতা, পৃ. ৯৩